নেত্রকোনার পথে প্রান্তরে...

মো. জিল্লুর রহমান

সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের ব্যানারে আগামী ডিসেম্বরে টাঙ্গাইলের অর্জুনায় পাঠাগার সম্মেলন ২০২২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলন উপলক্ষে 'পাঠাগার আন্দোলন: সঙ্কট, উত্তরণ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বেসরকারি গ্রন্থাগারের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে। পাঠাগার সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক আবদুস ছাত্তার খানের ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানতে পেরে গবেষণাকাজে ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাই। উদ্দেশ্য ছিল, এই সুযোগে আমাদের এলাকার পাঠাগারগুলোর কার্যক্রম আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং পাঠাগার-উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা। সেইসঙ্গে নিজের দেশটাও ঘুরে দেখার একটা সুযোগ পেলে মন্দ হয় না।

তো যেই ভাবা, সেই কাজ। আবদুস ছাত্তার খান মহোদয়ের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই পরিকল্পনা করতে থাকি কীভাবে কম সময়ে এবং কম খরচে ময়মনসিংহ বিভাগের তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করতে পারি। এরই মাঝে গবেষণাকাজের বিভিন্ন কারিগরি দিক সম্পর্কে অনলাইন প্ল্যাটফরমে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতিমূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই মাঝে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে সিলেট এবং খুলনা বিভাগের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আমার একাডেমিক শিক্ষা সফরের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শুরু করতে পারি নি।

এরপর শিক্ষাসফর থেকে ফিরে এসে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভ্রমণ-পরিকল্পনা সম্পন্ন করি। প্রথমেই নেত্রকোনা জেলায় কাজ করার চিন্তা করি, কেননা ময়মনসিংহ জেলার পর নেত্রকোনাই সবচেয়ে বড় জেলা। আর, ময়মনসিংহের সবগুলো উপজেলায় আমার আগে থেকেই ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা থাকায় ময়মনসিংহকে সবার শেষে রাখি।

এরপর ছিল আবার মাস্টার্সের ক্লাস শুরুর বিষয়। তবে, ৫ তারিখে জানতে পারি এই সপ্তাহে ক্লাস শুরু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেদিন রাতেই ঢাকা থেকে নেত্রকোনার ট্রেনের সময়সূচি জেনে নিই; এবং হাওর এক্সপ্রেসের সময়টাই আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছিল। পরদিন সকালেই অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কেটে ফেলি একদম শেষ স্টপেজ মোহনগঞ্জ পর্যন্ত। রাত ১০টা ১৫ মিনিটে ছিল ট্রেন ছাড়ার সময়। সন্ধ্যার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রওনা দিয়ে ঢাকায় গিয়ে ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করি। ফাইজুল ভাই ময়মনসিংহের 'আলোর ভুবন' পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা এবং বইপড়া আন্দোলন, নান্দাইলের সাধারণ সম্পাদক।

নান্দাইল হচ্ছে নেত্রকোনার একেবারে কাছাকাছি উপজেলা। এজন্যই নেত্রকোনা এবং ময়মনসিংহের ভ্রমণ-পরিকল্পনা নিয়ে ওনার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। এ সময়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল কুষ্টিয়ার খোকসা কমিউনিটি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা জসিম উদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে। ওনার সঙ্গেও পাঠাগার সম্মেলন এবং গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। এ সময়ে ফাইজুল ভাই 'জাগ্রত আছিম গ্রন্থাগারের' জন্য বেশ কিছু বই উপহার প্রদান করেন। বইগুলো আমাদের গ্রন্থাগারের সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাকির হাসান কাউসারের কাছে রেখে আমি কমলাপুর চলে যাই।

ভোর ৫টার দিকে আমাদের ট্রেন মোহনগঞ্জ পৌঁছায়। মসজিদ থেকে ফজরের আজান ভেসে আসছিল তখন। স্টেশন মসজিদেই ফ্রেশ হয়ে, নামাজ পড়ে সূর্যোদয়ের পর আমার গন্তব্যের বিষয়ে চিন্তা করি। মোহনগঞ্জ পৌরভবনের পাশেই অবস্থিত 'মোহনগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার'। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্থানীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কাজে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে এই প্রতিষ্ঠান। এ পাঠাগারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলম বিপ্লব স্যারের সঙ্গে আগের দিন ফোনে কথা বলেছিলাম। গত মাসেই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের একটি প্রশিক্ষণে ওনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। স্যার আমাদেরকে দেখা করার জন্য সকাল ৯টায় সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন বাজে মাত্র ৬টা। আগের পরিকল্পনা ছিল ট্রেন কিছুটা বিলম্বে পৌঁছালে এই সময়টা মোহনগঞ্জেই অপেক্ষা করব। কিন্তু সঠিক সময়ে ট্রেন পৌঁছানোর কারণে ৩ ঘণ্টা সময় কোনো কাজ ছাড়া অপেক্ষা করতে ভালো লাগছিল না।

পাঠাগারের পাশেই একটা সিএনজি-চালিত অটোরিকশা-স্ট্যান্ডে চলে যাই। স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে পার্শ্ববর্তী উপজেলা খালিয়াজুড়ি, মদন ও আটপাড়ার দিকে যাওয়ার প্ল্যান করি। দ্রুতগতির জন্য অটো-চালকের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, ট্রেনে আসা সকল যাত্রী নিজ নিজ গন্তব্যে আগেই চলে গিয়েছে। এখন অটো'র যাত্রী ভর্তি হতে সময় লেগে যাবে। তবু অটোরিকশা করেই রওনা দিই খালিয়াজুড়ি উপজেলার বোয়ালি ঘাটের উদ্দেশে। ধীরগতির কারণে ২২ কি.মি. দূরত্বের বোয়ালি ঘাট পর্যন্ত পৌঁছতেই ৮টা বেজে গেল। খালিয়াজুড়ি যাওয়ার ব্যাপারে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানলাম ট্রলারে করে খালিয়াজুড়ি যাওয়া আসায় দীর্ঘসময় লেগে যাবে। যার ফলে অন্য কাজগুলো পরিকল্পনামতো সম্পন্ন করা যাবে না। এদিকে আবার খালিয়াজুড়ির কোনো পাঠাগারের ঠিকানাই আমার জানা ছিল না। এজন্যই খালিয়াজুড়ির পরিবর্তে আবার রওনা দিই পার্শ্ববর্তী মদন উপজেলার দিকে। বোয়ালি ঘাট থেকে মদন উপজেলা শহরের দূরত্ব ১২/১৩ কি.মি. মাত্র।

মোহনগঞ্জ থেকে বোয়ালি ঘাট পর্যন্ত আসার পথেই ডিঙ্গাপোতা হাওর এবং রাস্তার পাশের নাম না-জানা বিল ও হাওরগুলোর মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য দেখেছি আমরা। সেইসঙ্গে গ্রামের মানুষের সকালের ব্যস্ততাও আমাদের চোখে পড়েছে। মদন যাওয়ার পথে উচিতপুরের

হাওরগুলো মুগ্ধ করেছে আমাদেরকে। দর্শনার্থীদের কাছে এই হাওরগুলো উচিতপুর মিনি কক্সবাজার নামে পরিচিত। সকাল ৯টার দিকে মদন পৌঁছে এখানেও আমরা কোনো পাঠাগার খুঁজে পাই নি। তবে কাছেই আটপাড়া উপজেলার লোক-গবেষক হামিদুর রহমান পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক হাসান ইকবাল ভাইয়ের সঙ্গে আগের দিন যোগাযোগ করেছিলাম। তাই এবার এগিয়ে চলি সেই পাঠাগারের পথেই।

এরই মধ্যে গুগলম্যাপ থেকে আটপাড়া উপজেলায় আরও দুটি পাঠাগারের সন্ধান পেয়েছিলাম। তেলিগাতী সরকারি কলেজের পাশে অবস্থিত তেলিগাতী সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন পাঠাগারের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ভেতরে ঘুরে দেখতে পারি নি। তবে, স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে পাঠাগার পরিচালকের মোবাইল নাম্বার নিয়ে আসি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল আটপাড়া উপজেলা পাঠাগার। দৃষ্টিনন্দন ভবন থাকলেও এই পাঠাগারটির কার্যক্রম এখন বন্ধ আছে বলে জানালেন স্থানীয়রা। তারপর আমরা রওনা দিই আগে থেকেই যোগাযোগ করে রাখা লোক-গবেষক হামিদুর রহমান পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের দিকে। এ পাঠাগারটির কার্যক্রম ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হলেও নতুন ভবনে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে এ বছরের জানুয়ারি থেকে। ইতোমধ্যেই পাঠাগারটিতে বিভিন্ন বিষয়ের কয়েক হাজার বই এবং শিশুদের জন্য খেলার সামগ্রীও যুক্ত হয়েছে। খুবই মনোরম পরিবেশে এই পাঠাগারটির অবস্থান। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষার্থী এবং এলাকার মুরুব্বীরা এখানে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারেন। শিশুদের জন্য বেশ কয়েকটি ব্যতিক্রমী কার্যক্রম চোখে পড়েছে এখানে।

আটপাড়া উপজেলা থেকে আমাদের পথচলা ছিল নির্মলেন্দু গুণের স্মৃতিবিজড়িত বারহাট্টা উপজেলায়। অনলাইন প্ল্যাটফরম থেকে নির্মলেন্দু গুণের গ্রামের বাড়িতে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামসুন্দর পাঠাগার, বীণাপাণি-চারুবালা সংগ্রহশালাসহ আরও বেশ কিছু কার্যক্রমের বিষয়ে জানতে পেরেছিলাম। বারহাট্টা বাজার থেকে অটোরিকশায় কাশতলা গ্রামে পৌঁছই দুপুর ১টার দিকে (নির্মলেন্দু গুণ গ্রামটির নাম দিয়েছেন কাশবন)। কিন্তু এই সময়ে পাঠাগার ও সংগ্রহশালা ছিল তালাবদ্ধ। স্থানীয়রা জানান, আগে নিয়মিত খোলা থাকলেও নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারিক না থাকায় পাঠাগারের কার্যক্রম এখন অনিয়মিত পরিচালিত হয়। এরপর আবার আমরা বারহাট্টায় চলে আসি।

গুগলম্যাপ দেখে এবার চলে যাই বারহাট্টা পাবলিক লাইব্রেরিতে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটি উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এখনও ধুঁকে ধুঁকে চলছে। একজন গ্রন্থাগারিক সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পাঠাগারটি খোলা রাখেন। কয়েক হাজার বই থাকলেও নতুন বইয়ের বেশ অভাব রয়েছে এখানে। পাঠকসংখ্যাও খুব কম বলে জানা গেল। এরপর আবার আমরা চললাম মোহনগঞ্জের দিকে। কেননা মোহনগঞ্জের পাঠাগারগুলোতে সকালে যাওয়া সম্ভব হয় নি। মোহনগঞ্জ পৌঁছে দুপুরের খাওয়া শেষ করে গুগলম্যাপ দেখে চলে যাই ডা.

আখলাকুল হোসাইন আহমেদ গ্রন্থকুঞ্জে।
মোহনগঞ্জের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাবেক এমপি ডা. আখলাকুল হোসাইন আহমেদ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সঙ্গেই ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সপ্তাহের ৩ দিন বিকালবেলায় এই পাঠাগারটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা এবং মোহনগঞ্জ সাধারণ পাঠাগারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব স্যার পাঠাগার এবং বইগুলো ঘুরে ঘুরে দেখান আমাদের। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে যান মোহনগঞ্জ সাধারণ পাঠাগারে। এই পাঠাগারটি প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। পদাধিকারবলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাঠাগারটির সভাপতি হলেও সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয় খুব আড়ম্বরের সঙ্গে। শুধু মোহনগঞ্জ নয়, পুরো নেত্রকোনা জেলায় অন্যতম ৩/৪টি সচল পাঠাগারের মধ্যে মোহনগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার একটি। বিস্তৃত পাঠকক্ষ, হলরুম এবং আলাদা অফিসরুম রয়েছে পাঠাগারটির। নিয়মিত পাঠাগার খোলা রাখার জন্য এবং সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বেতনভুক্ত গ্রন্থাগারিক এবং একজন কর্মচারী রয়েছেন এখানে। ম্যাগাজিন প্রকাশনাসহ নানা উদ্যোগে সারা বছরই সচল থাকে পাঠাগারের কার্যক্রম। সেইসঙ্গে রয়েছে অসংখ্য বইয়েরও সংগ্রহ। মোহনগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার ঘুরে দেখার পর আমরা রওনা দিই নেত্রকোনার উদ্দেশে। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় এ দিন আর কোনো পাঠাগার পরিদর্শন করা সম্ভব হয় নি।

নেত্রকোনা সরকারি কলেজের ছাত্র, পরিচিত এক ছোটো ভাইয়ের বাসায় রাত্রিযাপনের পর–ভোরে আবার বের হই কলমাকান্দা, দুর্গাপুরের পথে। এর আগে দেখা করি আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনার সহকারী শিক্ষক সারোয়ার আলম জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে। জিয়া ভাই আমাদের জাগ্রত আছিম গ্রন্থাগারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। আগের দিন ওনার সঙ্গে কথা বলে সময় নেওয়া ছিল। পাঠাগার সম্মেলন এবং আমাদের গবেষণাকাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তখন। এরপর সময়-স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে মোটরসাইকেলে আমরা যাই কলমাকান্দা উপজেলার নাজিরপুরে। কিন্তু এখানে কোনো পাঠাগার খুঁজে পাই নি। আগের দিন হাসান ইকবাল ভাইয়ের কাছ থেকে নেত্রকোনা জেলার সরকার-নিবন্ধিত পাঠাগারের একটি তালিকা পেয়েছিলাম। সেই তালিকায় কলমাকান্দার মাত্র একটি পাঠাগারের নাম ছিল। অনলাইনে খুঁজতে গিয়ে এই পাঠাগারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ দেখে এখানে আর যাওয়া হয় নি।

এরপর বাসে করে রওনা দিই সোমেশ্বরীর তীরে দুর্গাপুর উপজেলার ‘পথ পাঠাগারের’ অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্দেশে। দুর্গাপুর পৌঁছে টঙ্ক শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ ও কমরেড মণি সিংহ স্মৃতি জাদুঘর ঘুরে দেখে আমরা যাই পথ পাঠাগারের কার্যালয়ে। পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠাতা নাজমুল হুদা সারোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল। ওনার নির্দেশনা অনুযায়ী পথ পাঠাগারের কার্যালয়ে গিয়ে দেখি একটি ফটোকপি ও অনলাইন সার্ভিস প্রদানকারী দোকানের একপাশে এর অবস্থান। দোকানটির পরিচালকও নাজমুল হুদা সারোয়ার ভাই নিজেই। কাজের সুবিধার্থে দুটি প্রতিষ্ঠানকেই একসঙ্গে নিয়ে এসেছেন উনি। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ২০টি

বই নিয়ে কাজ শুরু করে নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে এখন তিনি ১৪টির বেশি শাখা স্থাপন করেছেন। তবে, পথ পাঠাগারের 'জারিয়া ঝাঞ্জাইল রেলওয়ে স্টেশন শাখা' পরিদর্শন করে আমার খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা হয় নি। যথেষ্ট সময় নিয়ে অন্যান্য শাখাগুলোও ঘুরে দেখে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে হয়তো।

সোমেশ্বরী নদী পেরিয়ে এবার আমাদের পথচলা ছিল বিরিশিরির জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্র অভিমুখে। সোমেশ্বরী নদীর সেতুর সঙ্গেই একটি সেলুনে স্থাপিত হয়েছে জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্রের ২য় শাখা। প্রায় ২ শতাধিক বই রয়েছে এই সেলুন-পাঠাগারটিতে। পাঠাগারটিতে প্রবেশের পূর্বেই আমরা দেখতে পাই একজন পত্রিকা পড়ছেন চেয়ারে বসে। বেশ কিছু বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে টেবিলের উপর। শুধুই যে সাজিয়ে রাখার জন্য নয় বইগুলো, সেটাই বুঝতে পারলাম এতে। এখান থেকে ৫ কি.মি. দূরে গাভিনা গ্রামে অবস্থিত জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্রের প্রধান শাখা। নিজস্ব দুটি ভবনে খুবই সাজানো-গোছানোভাবে পাঠাগারটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আগের দিন ফোনে কথা হয়েছিল পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠাতা দীপক সরকার ভাইয়ের সঙ্গে। উনি ময়মনসিংহের একটি কলেজে শিক্ষকতা করায় স্থানীয় এক ব্যক্তি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে আছেন এখন। তিনিই আমাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখালেন এবং জলসিঁড়ির কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। এদিন সন্ধ্যার পর আবার দীপক ভাইয়ের সঙ্গে নেত্রকোনা শহরে সরাসরি দেখা করেছিলাম। তখন আরও বিস্তারিতভাবে নেত্রকোনার শিল্প, সাহিত্য ও বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। দীপক সরকার ভাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দে জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আরও ১০ বছর আগে থেকেই জলসিঁড়ি অধ্যয়নসভার মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ করে আসছেন।

জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্র থেকে আমরা যাই জারিয়া ঝাঞ্জাইল স্টেশনে। সেখানে পথ পাঠাগারের শাখা পরিদর্শনের পরই দেখি–ময়মনসিংহগামী লোকাল ট্রেন ছাড়ার সময় এখন। জারিয়া ঝাঞ্জাইল থেকে ২৩ কি.মি. দূরের শ্যামগঞ্জের টিকিটের মূল্য মাত্র ১০ টাকা। অথচ এই ১০ টাকার টিকিট কাটতেই সকলের মাঝে কত যে অনীহা দেখলাম। আমরা শ্যামগঞ্জ এসে পৌঁছলাম দুপুর আড়াইটার দিকে। আগে থেকেই যোগাযোগ করে রাখায় পূর্বধলার শাহেদা স্মৃতি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক লেনিন খান পাঠান ভাই অপেক্ষা করছিলেন শ্যামগঞ্জ বাজারেই। ওনার সঙ্গে রওনা দিই বীর উত্তম কর্নেল তাহেরের স্মৃতি বিজরিত কাজলা গ্রামের দিকে। ক্রাচের কর্নেল পড়ে কর্নেল তাহের এবং তাঁর গ্রামের বাড়ি সম্পর্কে আলাদা একটা আবেগ কাজ করছিল। শাহেদা স্মৃতি পাঠাগারটি কর্নেল তাহেরের বাড়ি এবং কবরস্থানের পাশেই অবস্থিত।

কাজলা বাজারের সামান্য দূরে একদম পাকারাস্তার পাশেই নিজস্ব জায়গায় দৃষ্টিনন্দন পাঠাগারভবন। বেশ কয়েক হাজার বইয়ের পাশাপাশি এখানে রয়েছে নিরিবিলিতে বসে

সারা দিন বই পড়ার ব্যবস্থা। একসঙ্গে ৩০/৪০ জন পাঠক এখানে বই পড়তে পারেন। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিনের একটি বিশাল সংগ্রহ। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার আনসার উদ্দিন খান পাঠান তার মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারে কোনো কিছুর কমতি রাখেন নি। গ্রামের নারী থেকে শুরু করে শিশু, কিশোর এবং বৃদ্ধরাও এখানে নিয়মিত বই পড়তে আসেন। সেইসঙ্গে গ্রন্থাগারিক লেনিন খান পাঠান ভাইয়ের দরদ মাখানো পরিচর্যায় পাঠাগারটি জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে সর্বত্র। এখান থেকে আমরা আবার চলে যাই নেত্রকোনা শহরে। গুগলম্যাপ দেখে নেত্রকোনা শহরের দুটি পাঠাগারের খোঁজ করলেও আমরা সফল হই নি। অতঃপর দীপক ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎশেষে ময়মনসিংহের দিকে রওনা দিই আমরা।

এই ২ দিনের পথচলায় আমরা নেত্রকোনার ৯টি উপজেলায় গিয়েছিলাম। শুধু কেন্দুয়া উপজেলায় আমাদের কাজ করা বাকি ছিল। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ জেলায় ভ্রমণের সময়ে গৌরিপুর থেকে আমরা যাই কেন্দুয়ার দলপা ইউনিয়নের বেখৈরহাটি বাজারে অবস্থিত অন্বেষা পাঠাগারে। অন্বেষা পাঠাগারটি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। কয়েক হাজার বই রয়েছে এখানে। তবে অধিকাংশই বেশ পুরোনো বই। আমরা যখন পাঠাগারটি পরিদর্শন করি তখন দেখতে পাই–একজন বাঁধাইকর্মী পাঠাগারের পুরাতন বই বাঁধাইয়ের কাজ করছেন। তিনি জানালেন, ৪০০ বই বাঁধাইয়ের কাজ দেওয়া হয়েছে তাকে। স্থানীয় এক স্কুলছাত্রের কাছ থেকে জানতে পারি, জীর্ণশীর্ণ এই টিনের ঘরের পরিবর্তে অন্য জায়গায় পাঠাগারটি স্থানান্তর করার কাজ চলছে।

পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে আবারও সগৌরবে পরিচালিত হবে বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর হিসেবে কাজ করবে এসব পাঠাগার। এমনটাই প্রত্যাশা আমাদের।